Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 101-108
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.023

ভূমি ও মূল্যবোধ: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ভূমির প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ

বিনন্দ সরেন, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, নগর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.07.2025; Accepted: 30.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper titled 'ভূমি ও মূল্যবোধ: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ভূমির প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ (Land and Values: Ethical Responsibility toward Land in Eastern and Western Philosophy) explores the ethical perspectives and philosophical values regarding land in both Eastern and Western traditions. In Eastern philosophy- particularly in Vedic, Upanishadic, Buddhist, and Jain thought- land is viewed not merely as a material resource, but as a living entity, a mother figure, and an essential part of moral coexistence. Duties toward land, a sense of indebtedness, and empathy are central themes in these traditions. In contrast, Western philosophy presents a layered and evolving conception of land. From ancient Greek materialism and Christian colonial mindsets to modern environmental ethics-such as Aldo Leopold's Land Ethic and Arne Naess's Deep Ecology- Western thought has opened new avenues for ethical reflection on land. By analyzing the similarities and differences between Eastern and Western perspectives, this study highlights the need for a comprehensive, intersubjective ethical approach to land, which can provide vital philosophical insights in addressing contemporary ecological crises.

Keywords: Land Ethics, Moral Responsibility, Practical Ethics, Eastern, Philosophy, Western Philosophy, Values

বর্তমান বিশ্ব এক গভীর পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি। জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, মৃত্তিকা অবক্ষয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষকরণ— এই সব সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের ভূমির প্রতি ভোগবাদী, অধিকারনির্ভর ও শোষণমূলক মনোভাব। ভূমিকে কেবল উৎপাদনের উপকরণ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দেখা, এই সংকটকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। এই বাস্তবতায় ভূমিকে একটি নৈতিক সত্তা হিসেবে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি নীতিবিদ্যা বিষয়টি মূলত আধুনিক পরিবেশদর্শনের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে অল্ডো লিওপোল্ডের 'Land Ethic' তত্ত্বের মাধ্যমে, যেখানে ভূমিকে একটি নৈতিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলাহয়েছে। তবে, ভূমির প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধের ধারণা একমাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাতেই নয়, বরং প্রাচ্য দর্শনেও প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান। ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে ভূমিকে মাতৃস্বরূপ, জীবন্ত ও চৈতন্যধারী সত্তা হিসেবে দেখা হয়েছে, যার প্রতি মানুষের রয়েছে ঋণ, কর্তব্য ও সহানুভূতির বন্ধন। এই গবেষণাপত্রে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ভূমির নৈতিক অবস্থান, দার্শনিক ব্যাখ্যা ও মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করব। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব- কিভাবে মানবজাতির ভূমির প্রতি আচরণ শুধুমাত্র অধিকার নয়, বরং এক গভীর নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে। এই চিন্তা শুধু তাত্ত্বিক নয়, বরং তা বর্তমান পরিবেশ- সংকট মোকাবিলার জন্যও এক জরুরি দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করতে পারে।

ভূমি কেবল একটি ভূ-ভৌগলিক সত্তা নয়, এটি মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, উৎপাদন, অস্তিত্ব এবং নৈতিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ইতিহাস জুড়ে মানুষ ভূমির সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, তা কখনো ছিল পবিত্রতা ও দায়িত্ববোধে পূর্ণ, আবার কখনো নিছক ভোগ্য সম্পদ হিসেবে। মানবসভ্যতার প্রারম্ভে ভূমিকে দেখা হতো একটি জীবন্ত সত্তা বা মাতৃস্বরূপ শক্তি হিসেবে। আদিম জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী সংস্কৃতিতে ভূমি ছিল পবিত্র, অলঙ্ঘনীয় ও আত্মিক সম্পর্কের প্রতীক। ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে। ভূমি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, পুঁজিবাদী উৎপাদন ও প্রযুক্তি-নির্ভর আধিপত্যের ভিত্তি। এই পরিবর্তন বিশেষ করে পাশ্চাত্য আধুনিক দর্শনের প্রভাবে ত্বরান্বিত হয়, যেখানে ভূমি একটি নৈর্ব্যক্তিক বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়, যার উপর মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী মালিকানা দাবি করে। ভূমিকে সম্পত্তিতে রূপান্তরের এই ধারণা এক গভীর দার্শনিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। প্লেটোর আদর্শবাদ ও অ্যারিস্টটলের উদ্দেশ্যবাদী চিন্তায় প্রকৃতি ও ভূমিকে একটি উদ্দেশ্যযুক্ত সত্তা হিসেবে দেখা হলেও, পরবর্তী সময় লক, হিউম এবং হবস প্রমুখ চিন্তাবিদদের দর্শনে ভূমি এক ব্যক্তিগত অধিকারের বস্তুতে পরিণত হয়।

ভারতীয় দর্শনে, বিশেষকরে ঋগ্বেদ, উপনিষদ ও বৌদ্ধ-জৈন চিন্তায় ভূমি কখনোই নিছক বস্তু নয়, বরং এটি 'ধরণী' অর্থাৎ ধারণকারী- যে সমস্ত প্রাণকে ধারণ ও পালন করে। এখানে ভূমি ও মানুষের সম্পর্ক অস্তিত্বগত এবং আন্তঃনিষ্ঠ। ভূমির নৈতিকতা প্রশ্নটি মূলত এই আলোচনা থেকে জন্ম নেয়— মানুষ কি ভূমির প্রতি কোনো দায়িত্ব বহন করে? না কি ভূমিকে কেবল শোষণযোগ্য একটি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়?- এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আধুনিক পরিবেশনৈতিক দর্শন, বিশেষকরে অল্ডো লিওপোল্ডের Land Ethic, ভূমিকে এক 'নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য' হিসেবে বিবেচনা করতে শেখায়। একইভাবে, অ্যারনে নেসের ডীপ-ইকোলজি ধারণায় ভূমিকে এক আন্তঃসত্তাগত নৈতিক পরিসরের অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে। এখানে মূলত ভূমির প্রতি মানুষের দর্শনগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পর্যালোচনার ভিত্তি গড়ে দেয়। ভূমির প্রতি মানবিক আচরণ কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং একটি গভীর নৈতিক ও অস্তিত্বগত প্রশ্ন।

Main-body:

প্রাচ্য দর্শনে ভূমির নৈতিকতা:

প্রাচ্য দর্শন; বিশেষত ভারতীয় দর্শন ভূমিকে কখনোই কেবল বস্তুগত সম্পদ বা ব্যক্তিগত মালিকানার বস্তু হিসেবে দেখেনি। বরং এখানে ভূমিকে দেখা হয়েছে এক পবিত্র, জীবন্ত ও আন্তঃসত্তাগত সত্তা হিসেবে, যার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ধর্ম, ঋণ, কর্তব্য ও নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ আছে। এই অংশে মূলত ভারতীয় প্রাচীন বৈদিক ও উপনিষদীয় দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন নীতিবিদ্যা, এবং গান্ধীবাদী চিন্তাধারায় ভূমির নৈতিক অবস্থান আলোচনা করব।

বৈদিক ও উপনিষদীয় দর্শনে ভূমি:

ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ-এ ভূমিকে 'ধরণী', 'পৃথিবী-মাতা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে বলাহয়েছে-

> "ভূমিঃ ত্বামধি মা হ্বং দধাতু। অপি ত্বা পৃথিবি মন্যতে দেবেন মনসা সমগ্নিঃ।
> তত্ তে নাম সুদিনং দেব যাতু। অস্মিন্ লোকে অগ্নয়ঃ শান্তিমায়ন্তু॥"[১]

হে পৃথিবী, তুমি যেন আমাকে তোমার কোলে ধারণ করো। যেন দেবতারা, অগ্নিদেবতাসহ, শান্তির মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করেন। যেন এই অন্ত্যযাত্রা শুভ হয়, এবং এই মৃত্যু যেন দেবতার অভ্যর্থনার মতন হয়। পৃথিবী যেন তাকে শান্তি দান করে। এই শ্লোকটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উচ্চারিত হয়, যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহকে মাটিতে সমর্পণ করা হয়। এখানে ভূমিকে মাতা বা আশ্রয়দাত্রী রূপে দেখা হচ্ছে, যিনি দেহকে গ্রহণ করে চিরনিদ্রার শান্তি দান করেন। এটি ঋগ্বেদের অন্যতম প্রাচীনও মানবিক মন্ত্র, যা মৃত্যুর মুহূর্তে পৃথিবীর সঙ্গে আত্মিক পুনর্মিলনের ভাব প্রকাশ করে। অথর্ববেদের 'ভূমি সুক্তে'-এর প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে-

> "মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।"[২]

অর্থাৎ ভূমি আমার জননী, আমি তার সন্তান। অথর্ববেদের 'ভূমি সুক্ত' ৬৩টি মন্ত্র বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ সূক্ত যা সম্পূর্ণভাবে ভূমিকে মাতৃরূপে বন্দনা করে গঠিত। এই সূক্তে পৃথিবীর উর্বরতা, সহনশীলতা, পরিবেশ, সমাজিক স্থিতি এবং মানবজীবনের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একে আধুনিক পরিবেশদর্শনের

অন্যতম প্রাচীন উৎস বলা যেতে পারে। পৃথিবী এখানে এক পবিত্র অস্তিত্ব, যার প্রতি মানুষের ঋণ স্বীকারের বোধ রয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে-

"यो ह वै भूमिꣳ वेद न स हिंस्यात् तं भौमा भूतानि न हिन्सन्ति।"[৩]

যে ব্যক্তি ভূমিকে যথাযথভাবে জানে ও উপলব্ধি করে, সে কখনও ভূমির ক্ষতি করে না। এবং পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীও তার কোনো ক্ষতি করে না। এই শ্লোকে ভূমিকে 'জ্ঞানযোগ্য' এবং 'সতর্কভাবে রক্ষা করার যোগ্য' রূপে দেখানো হয়েছে। এটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে ভূমির সুরক্ষার ধারণাকে সমর্থন করে। উপনিষদীয় দর্শনে 'সর্বভূতে আত্মদর্শন' ও 'ঐক্যদর্শন'- যার মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই, তাতে ভূমিও আত্মার পরিসরেই পড়ে। তাই ভূমিকে আঘাত করা মানে নিজের অস্তিত্বেই আঘাত হানা।

বৌদ্ধ দর্শনে ভূমির প্রতি অহিংসা ও সহানুভূতি:

বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার মূল ভিত্তি হল অহিংসা ও করুণা। ভূমি কেবল বস্তু নয়, তার মধ্যে প্রাণের সম্ভাবনা রয়েছে। বৌদ্ধ সূত্রে বলা হয়-

"यो मङ्गलं भूतानं पञ्च उपदाय धातुयो,
अग्गं धम्मं ततो वन्दे, संखार उपसंपदं।"[৪]

যিনি সকল জীবের মঙ্গল কামনা করেন এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ- এই পঞ্চ মহাভূতের উপলব্ধি করেন, তিনি সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত। এই চিন্তায় ভূমির প্রতি যত্ন, সহনশীলতা ও সহানুভূতির নৈতিক অনুভব স্পষ্ট। বৌদ্ধ দর্শনে 'ভূমি' বিষয়টি উপাদান, ধ্যান, ধৈর্য ও নৈতিকতার প্রতীক, এবং মৌলিক অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

জৈন দর্শনে অচৈতন্য সত্তার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব:

জৈন ধর্মের পঞ্চ মহাব্রতের অন্যতম হল 'অহিংসা', যা শুধু প্রাণীর প্রতি নয়, অচৈতন্য সত্তার প্রতিও প্রযোজ্য। উমাস্বাতি বলেছেন–

"पृथिव्यपः तेजोवायुः वनस्पतयश्चैकेंद्रियाः।"[৫]

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং উদ্ভিদ— এরা সকলেই একেন্দ্রিয় জীব। জৈন ধর্ম মতে, ভূমি বা পৃথিবী শুধু বস্তু নয়- জীবাত্মা। ভূমিকে খনন, আগুনে পোড়ানো, ধ্বংস করা- সবই হিংসা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নীতি থেকেই উদ্ভূত হয় জৈন পরিবেশনীতি বা পরিবেশতত্ত্ব, যেখানে 'অহিংসা' কেবল মানুষের প্রতি নয়, ভূমিসহ সকল জীবের প্রতি প্রযোজ্য। ফলে ভূমি নষ্ট করা মানেই হিংসা করা, যা পাপ ও অধর্ম। জৈন দর্শন ভূমির সঙ্গে এমন এক নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে যা আধুনিক পরিবেশবাদী চিন্তার আগেই এক আন্তঃসত্তাগত দায়ের আভাস দেয়।

গান্ধীয় ভূমি-নৈতিকতা:

মহাত্মা গান্ধী প্রাচীন প্রাচ্য-নৈতিকতার আধুনিক রূপ দিয়েছেন। তাঁর মতে,

> "The Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed."[৬]

অর্থাৎ, পৃথিবী প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ দেয়, কিন্তু প্রত্যেকের লোভ মেটানোর জন্য নয়। তাঁর কাছে ভূমি কেবল চাষযোগ্য জমি নয়, বরং মানবিক কর্তব্য ও ত্যাগের ক্ষেত্র। তিনি 'ট্রাস্টশিপ' তত্ত্বের মাধ্যমে ভূমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য না করে, সর্বজনীন কল্যাণের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেন। এখানে ভূমির প্রতি এক নৈতিক দায়িত্ববোধ ও আত্মিক সম্পর্কের কথা উঠে আসে।

অর্থাৎ, প্রাচ্য দর্শনে ভূমিকে দেখা হয় এক জীবন্ত, আত্মসত্তাগত, নৈতিক পরিসর হিসেবে। এখানে ভূমির প্রতি দায়িত্ব কেবল আইনগত নয়, এক নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্যও। ভারতীয় দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক পাশ্চাত্য পরিবেশ-নীতিবিদ্যার মতো 'সম্পদ-কেন্দ্রিক' নয়, বরং 'সম্পর্ক-কেন্দ্রিক'- যেখানে ভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সেবা, ঋণ, সহানুভূতি ও আত্মিকতার ভিত্তিতে নির্মিত।

পাশ্চাত্য দর্শনে ভূমির ধারণা ও নৈতিক অবস্থান:

পাশ্চাত্য দর্শনে ভূমির ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে ভূমিকে কখনও একটি সুসংগঠিত সত্তা হিসেবে দেখা হয়েছে, আবার মধ্যযুগে তা খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরের অধীন বস্তু হয়ে পড়েছে। আর আধুনিক দর্শনে ভূমি একটি 'সম্পদ' বা 'ব্যক্তিগত মালিকানা' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে, বিংশ শতকের

মাঝামাঝি সময় থেকে কিছু চিন্তাবিদ ও পরিবেশনীতিবিদ ভূমিকে এক নৈতিক সত্তা হিসেবে পুনর্ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে ভূমি ও প্রকৃতি:

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল প্রকৃতিকে একটি উদ্দেশ্যনির্ধারিত সত্তা (teleological entity) হিসেবে দেখতেন। তাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও ভূমি ছিল সৃষ্টির এক সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ। অ্যারিস্টটল বলেন,

> "Property, such as land, should be used in common but possessed privately with moderation."[৭]

অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতে পারে, তবে ব্যবহারে সমবায় ন্যায্যতা ও সংযম জরুরি। অত্যধিক জমি দখল রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, প্রকৃতির একটি অংশ। কিন্তু একইসঙ্গে তিনিই ভূমিকে ব্যবহারযোগ্য (instrumental) হিসেবে দেখেছেন, বিশেষ করে কৃষি ও সম্পদের উৎস হিসেবে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে ভূমি এখনও কিছুটা আধ্যাত্মিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকাঠামো হিসেবে বিবেচিত ছিল।

মধ্যযুগ ও খ্রিষ্টীয় চিন্তায় ভূমি:

মধ্যযুগে খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে ভূমির স্থান হয় ঈশ্বর-নির্মিত বস্তু হিসেবে, যার ওপর মানুষের কর্তৃত্ব রয়েছে। অ্যাকুইনাস বলেন-

> "God commanded the waters to be gathered together and the dry land to appear; this land He called Earth."[৮]

ভূমি এমন এক সৃষ্ট উপাদান, যা ঈশ্বরের আদেশে জলের আবরণ থেকে আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক পরিকল্পনার প্রতিফলন। এখানে ভূমিকে একটি নির্ধারিত আধ্যাত্মিক ও জাগতিক দায়িত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা হয়। ভূমির আত্ম-মূল্য নেই, কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যপূরণের উপায় হিসেবে ব্যাবহৃত হয়। অ্যাকুইনাস কখনও ভূমিকে নিজস্ব 'intrinsic value'র অধিকারী বলেননি, কিন্তু বলেন এটি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য অপরিহার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভূমিকে আত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একধরনের 'ঈশ্বর প্রদত্ত সম্পদ'- এর রূপ দেয়। ফলে মানুষের কর্তৃত্ব ও ব্যবহারিক অধিকার ভূমির উপর নৈতিকতা ছাড়াই প্রতিষ্ঠা পায়।

আধুনিক দর্শনে ভূমি: মালিকানা ও শোষণ:

জন লক 'দেহের শ্রম' দিয়ে ভূমিকে নিজের সম্পত্তিতে রূপান্তর করার যুক্তি দেন। তাঁর মতে,

> "As much land as a man tills, plants, improves, cultivates, and can use..... so much is his property".[৯]

ব্যক্তি ভূমির মালিকানা অর্জন করতে পারে, যখন সে ভূমির উপর নিজের শ্রম মেশায়, চাষ, উন্নয়ন, সংস্কার, জমির ব্যবহারে সুবিধা তৈরি করে। এই ধারণাই পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও জমি-অধিকারে একাধিপত্যবাদী নীতির দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করে।

ডেভিড হিউম এবং থমাস হবস-এর চিন্তায়ও ভূমি কেবল ব্যক্তি-স্বার্থ ও নিরাপত্তার অধীন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে ভূমির নৈতিক মূল্য বা আন্তঃসম্পর্ক ভিত্তিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত।

অল্ডো লিওপোল্ড ও ভূমি নীতিবিদ্যার জন্ম:

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত 'A Sand County Almanac'এ অল্ডো লিওপোল্ড 'Land Ethic' ধারণা তুলে ধরেন। তাঁর মতে

> "A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise."[১০]

এই নীতিতে ভূমিকে একটি নৈতিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে দেখা হয়, যেখানে মানুষ কেবল 'মালিক' নয়, বরং 'নির্বাহী সদস্য'। লিওপোল্ড প্রস্তাব করেন, নৈতিকতার সীমা মানুষ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে ভূমি, জল, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন ভূমি মাত্র সম্পদ নয়, একটি জীববৈচিত্রিক সম্প্রদায়। ভূমির অংশবিশেষ যেমন মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণী সবই এই সম্প্রদায়ের অংশ। তাই তাকে ব্যবহার করার আগে মানবজাতির উচিত তার মধ্যে জীববৈচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। তিনি 'land-community' কথাটির মাধ্যমে

বোঝাতে চেয়েছেন, ভূমিকে মানুষের দাস বা শোষণের বস্তু রুপে না দেখে সমবায়ী সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

ডীপ-ইকোলজি ও অ্যারনে নেস:

অ্যারনে নেস-এর "Deep Ecology" তত্ত্ব পাশ্চাত্য দর্শনে এক বিপ্লবী ধারা। তিনি বলেন-

> "The well-being and flourishing of human and non-human life on Earth have intrinsic value…. independent of the usefulness of the non-human world for human purposes."[১১]

অর্থাৎ পৃথিবীতে মানব ও অমানব জীবনের কল্যাণ ও বিকাশের একটি অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে, যা মানুষের প্রয়োজনে অমানব জগতের উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে ভূমিকে একটি স্বয়ং সত্তা (intrinsic worth) হিসেবে ধরা হয়। অ্যারনে নেস মনে করেন, প্রকৃতি ও ভূমি কেবল মানুষের ব্যবহারের জন্য নয়, তারা নিজেরাই একটি মূল্যবান সত্তা, নিজেদের অস্তিত্বেই তাদের গুরুত্ব রয়েছে। এই দর্শন প্রকৃতি ও ভূমির প্রতি নৈতিক শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ তৈরিতে সহায়ক। এই দর্শনে মানুষ ও ভূমির মধ্যে কোনো শ্রেণিবিন্যাস নেই; বরং মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ ও ভূমি—সবই একটি সাম্যবাদী জীবগোষ্ঠীর অংশ। ভূমির প্রতি দায়িত্ব শুধু প্রয়োজনে নয়, নিজস্ব অস্তিত্বগত কারণেও অপরিহার্য।

রল্‌স ও পরিবেশ-ন্যায়:

জন রল্‌স এমন এক পরিবেশ ন্যায়ের ধারণাকে সামনে আনেন, যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচারের চর্চা কেবল মানব সমাজের ওপর সীমাবদ্ধ নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরও প্রযোজ্য। রল্‌সের মতে-

> "No one gains or losses from his arbitrary place in the distribution of natural assets ...without giving or receiving compensating advantages in return."[১২]

প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিভার বণ্টন সম্পূর্ণরূপে দৈব বা 'arbitrary' (স্বেচ্ছাকৃত) নয়। কেউ যদি এমন সম্পদের সুবিধাভোগী হন, তবে তাকে এই সুবিধার সমান মূল্য সমাজকে ফেরত দিতে হবে বা সমাজের ন্যূনতম সুবিধাভোগী মানুষদের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে। অর্থাৎ, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধরনের স্বেচ্ছা সুবিধা এককভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে ভূমিকে একটি ন্যায়সঙ্গত সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার উপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারও স্বীকৃত।

অর্থাৎ, পাশ্চাত্য দর্শনে ভূমির ধারণা এক বহুমাত্রিক পথ অতিক্রম করেছে, আধ্যাত্মিকতা থেকে মালিকানা, এবং অবশেষে নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে বিবর্তিত হয়েছে। লিওপোল্ড, নেস ও সমসাময়িক চিন্তাবিদরা ভূমির নৈতিক অবস্থানকে পুনর্নির্মাণের প্রয়াসে নতুন এক দর্শনচিন্তা শুরু করেছেন, যা আধুনিক পরিবেশচেতনার অন্যতম ভিত্তি।

Analysis & Discussion:

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

ভূমির প্রতি মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দর্শনচিন্তার উপর নির্ভর করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই দুই দর্শনধারায় ভূমিকে ঘিরে গড়ে ওঠা নৈতিকতা ও সম্পর্কের ধারণা পরস্পরের থেকে ভিন্ন, তবে কিছু ক্ষেত্রে পরিপূরকও।

ভূমির অস্তিত্ব ও সত্তা:

প্রাচ্য দর্শনে, ভূমিকে দেখা হয় এক চৈতন্যপূর্ণ সত্তা হিসেবে। ভারতীয় দর্শনে 'পৃথিবী' হল 'ধরণী', যে ধারণ করে, পালন করে, মাতৃস্বরূপ। ভূমি এখানে আত্মিক ও অস্তিত্বগতভাবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তায় এমনকি মৃত্তিকাকেও একেন্দ্রীয় প্রাণ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার প্রতি হিংসা পরিত্যাজ্য। পাশ্চাত্য দর্শনে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা প্রকৃতিকে কিছুটা লক্ষ্যনির্ধারিত সত্তা হিসেবে দেখলেও, মধ্যযুগ থেকে ভূমি ক্রমে বস্তুগত সম্পদ ও ঈশ্বরপ্রদত্ত মালিকানা হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক কালে তা হয়ে দাঁড়ায় সম্পত্তি ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়।

নৈতিক সম্পর্ক বনাম মালিকানাভিত্তিক সম্পর্ক:

প্রাচ্যে ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে নৈতিক দায়িত্ব, ঋণ ও সহানুভূতির ভিত্তিতে। বেদে বলা হয়, মানুষ প্রকৃতির ঋণগ্রাহী, যাকে 'ঋণত্রয়' তত্ত্বে বিশেষভাবে উচ্চারিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি মূলত মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার। জন লক-এর "লেবার থিওরি অব প্রপার্টি" তে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই ধারণা উপনিবেশবাদ, কৃষিবিপ্লব এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভূমির একচেটিয়া অধিকারকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠা করে।

অন্তর্নিহিত মূল্য বনাম উপযোগবাদী মূল্য:

প্রাচ্য দর্শনে, ভূমির অন্তর্নিহিত (intrinsic) মূল্য রয়েছে। এটি কেবল উপযোগের বস্তু নয়, বরং ধর্মীয়, আত্মিক ও নৈতিকভাবে মূল্যবান। পাশ্চাত্য দর্শনে, বিশেষত আধুনিক যুগে ভূমির মূল্য উপযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, কী পরিমাণে তা উৎপাদনে সহায়ক, ব্যবহারে উপকারী, কিংবা বাজারে বিক্রয়যোগ্য। তবে লিওপোল্ড, নেস প্রমুখ পরিবেশনীতিবিদদের কাছে ভূমি আবার অন্তর্নিহিত মূল্য ফিরে পায়।

নৈতিক সম্প্রসারণের দৃষ্টিভঙ্গি:

প্রাচ্যে নৈতিকতা শুরু থেকেই সকল জীব ও প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে-

"অयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥"[১৩]

এটি আমার, ওটি অন্যের- এমন ভাবনা সংকীর্ণমনা মানুষের। উদারচিত্ত মানুষদের কাছে সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার। এখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যে এই নৈতিক সম্প্রসারণের ধারণা লিওপোল্ডের 'Land Ethic', নেসের 'Deep Ecology', এবং রল্‌স-এর পরিবেশ ন্যায়ের চিন্তার মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এটি তুলনামূলকভাবে নতুন ধারণা।

দার্শনিক ভাষা ও কাঠামোর পার্থক্য:

প্রাচ্য দর্শন প্রধানত আধ্যাত্মিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষায় ভূমির নৈতিকতা ব্যাখ্যা করে, যেখানে অধ্যাত্মা, কৃতজ্ঞতা, ঋণ ও করুণা মুখ্য। পাশ্চাত্য দর্শন তুলনামূলকভাবে যুক্তিবাদী ও মানবকেন্দ্রিক ভাষায় আলোচনা করে, যেখানে ন্যায়, অধিকার, সামাজিক চুক্তি ইত্যাদি বেশি গুরুত্ব পায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন উভয়ের ভূমির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের থেকে ভিন্ন হলেও সমকালীন সংকটে উভয়ের সম্মিলিত পাঠ প্রয়োজনীয়। একদিকে প্রাচ্যের নৈতিক সহাবস্থান ও আন্তঃসত্তাগত ভাবনা আমাদের আত্মিক দায়বদ্ধতা জাগিয়ে তোলে, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের যুক্তিনির্ভর নীতিশাস্ত্র আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান সময়ে যখন পরিবেশ সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, জমি-সম্পদের দখল ও ধ্বংস মানব অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে, তখন ভূমিকে শুধুমাত্র একটি বস্তুগত সম্পদ নয় বরং নৈতিক ও দার্শনিকভাবে মূল্যবান সত্তা হিসেবে পুনর্বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচ্য দর্শনে ভূমিকে দেখা হয়েছে এক জীবন্ত, চৈতন্যময়, মাতৃস্বরূপ সত্তা হিসেবে, যার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেবল ব্যবহারিক নয়, বরং ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক। ঋগ্বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে ভূমির প্রতি সহানুভূতি, ঋণ, এবং সমতার মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সহাবস্থানের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাসে ভূমি একাধিক ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন, বাইবেলীয় ধারার 'মানব-নিয়ন্ত্রক' দৃষ্টিভঙ্গি, মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্ব, এবং আধুনিক কালে লক বা রল্‌স-এর মত চিন্তকদের চিন্তায় ভূমিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযোগবাদী ও মালিকানাভিত্তিক একক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে উনবিংশ ও বিংশ শতকে পরিবেশনৈতিক চেতনার উত্থান—বিশেষ করে লিওপোল্ডের 'Land Ethic', নেসের 'Deep Ecology', এবং পরিবেশ-ন্যায়ের ধারণা—ভূমির প্রতি এক নবদৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়, যেখানে ভূমি আবার অন্তর্নিহিতভাবে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাচ্য দর্শনে যেখানে ভূমির প্রতি এক আত্মিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ মুখ্য, সেখানে পাশ্চাত্য দর্শনে আধুনিক যুক্তিবাদ ও নীতিশাস্ত্রের মাধ্যমে ভূমির ন্যায্য ব্যবহার ও ন্যায়ের ধারণা প্রাধান্য

পায়। যদিও এই দুই দর্শনচিন্তা পরস্পর ভিন্ন পথ ধরে চলেছে, তবুও সমকালীন পরিবেশ-সংকটে উভয় চিন্তার মধ্যে এক আন্তঃসংলাপ গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রাচ্যের সম্পর্কবাদিতা ও পাশ্চাত্যের নীতিশাস্ত্রের সমন্বয়ে আমরা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভূমি-নৈতিকতা নির্মাণ করতে পারি—যা কেবল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নৈতিক ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে।

এই গবেষণাপত্রের আলোকে বলা যায়, ভবিষ্যতের পরিবেশনীতি নির্ধারণে ভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং নৈতিক, আত্মিক ও দার্শনিক রূপে বোঝার মাধ্যমে এক নতুন ভূমিনৈতিকতার সূচনা সম্ভব। যেখানে ভূমি কেবল বস্তু নয়, বরং এক নৈতিক সত্তা, যার প্রতি আমাদের রয়েছে গভীর দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা যদি আমরা আন্তরিকভাবে আত্মস্থ করতে পারি, তবে একটি আরও ন্যায্য, সহনশীল ও টেকসই পৃথিবীর পথ প্রশস্ত হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. Swarupananda, Swami, translator. Rigveda Samhita: Bengali Translation with Original Sanskrit Text. Kolkata: Ramakrishna Math and Mission, 2015. ISBN: 9788180401645. Mandala 10, Sukta 18, Mantra 10, pp. 1292–1293.
2. Bharati, Kinjawadekar Ramchandra, editor. Atharvaveda Samhita (Sanskrit with Hindi and Bengali Translation). Vol. 4, Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2009. ISBN: 9788170801244. Kanda 12, Sukta 1, Verses 1–63, pp. 347–365.
3. Swami Madhavananda, translator. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (with the Commentary of Śaṅkarācārya). Kolkata: Advaita Ashrama, 2008. ISBN: 9788175051040, Adhay-5, Brahmn-7, Mantra-5, pp. 635–636.
4. Bhikkhu Bodhi, translator. The Suttanipata: An Ancient Collection of the Buddha's Discourses. Boston: Wisdom Publications, 2017. ISBN: 9781614293500, Uraga Sutta (Snp 1.1), pp. 39–41.
5. Tatia, Nathmal, translator. Tattvartha Sutra of Umāsvāti: That Which Is. San Francisco: Harper & Row, 1994. ISBN: 9780060636338, Sutra 2.13, Page: 47.
6. Gandhi, M.K. Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG), Vol. 25. New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1967. ISBN: 9788123002280, Page: 163.
7. Aristotle. Politics. Translated by Benjamin Jowett, edited by Jonathan Barnes, Princeton University Press, 1995. ISBN: 9780691016503, Book I, Chapter 5, Page: 68–70.
8. Aquinas, Thomas. Summa Theologiae. Translated by Fathers of the English Dominican Province, The Aquinas Institute, 2019. Vol. I, Prima Pars. Q. 69, Art. 1: ISBN: 9781937015845, pp. 150–152.
9. Locke, John. Second Treatise of Government. Edited by Peter Laslett, Cambridge University Press, 3rd ed., 1988. ISBN 9780521354486. Chapter-V("Of Property")Section 27: (§II.5.27)
10. Leopold, Aldo. A Sand County Almanac: And Sketches Here and There. Oxford University Press, 1949. ISBN 0-19-500777-8, Section: "The Land Ethic" (The Upshot, final section) pp. 171–178.
11. Sessions, George, ed. Deep Ecology for the Twenty-First Century. Shambhala Publications, 1995. ISBN: 9781570620492, pp. 67–70.
12. Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition, Harvard University Press, 1999, ISBN: 9780674000781. Part I, Chapter 1, Section 11. p. 87.

13. Mahopanishad, Chapter 6, Verse 71. In: The Principal Upanishads, translated by S. Radhakrishnan, HarperCollins India, 1994. ISBN: 9788172231248. Pp. 655.

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Leopold, Aldo. A Sand County Almanac. Oxford University Press, 1949.
2. Naess, Arne. "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement." Inquiry, vol. 16.
3. Callicott, J. Baird. In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy. State University of New York Press, 1989.
4. White, Lynn Jr. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." Science, vol. 155, no. 3767, 1967.
5. Guha, Ramachandra. "Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation: A Third World Critique." Environmental Ethics, vol. 11, no. 1, 1989.
6. Moriarty, Paul. "Virtue Ethics and the Land Ethic." Ethics & the Environment, vol. 9, no. 1, 2004.
7. স্বামী স্বরূপানন্দ। ঋগ্বেদ সংহিতা (বাংলা অনুবাদসহ)। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ২০১৫।
8. স্বামী গম্ভীরানন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ। আদ্বৈত আশ্রম, ২০১০।
9. বিদ্যার্থী, প্রফুল্ল। ভারতীয় পরিবেশ দর্শন। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ২০০২।
10. সেন, দীনেশচন্দ্র। বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি: প্রাকৃতিক চেতনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০।
11. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।